দ্বাদশ অধ্যায়

ভোলানাথের অসুখ

ভোলানাথের অসুখের সময় দ্বিপ্রহরে সিদ্ধেশ্বরীর আসনে যাইয়া শুইয়া থাকা হইত। অন্য সময় ভোলানাথের কাছে বসা হইত। একদিন সেখানে যাওয়া হইতেছে, শরীরের সঙ্গে সত্যবাবুর স্ত্রী ও আরও কয়েকজন মহিলা গেল। তাহারা কতক্ষণ বসিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় বলিল — আমরা বাবাকে দেখিয়া আবার আসিব। এ শরীরও 'আচ্ছা' বলিল ও দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। শরীর একেবারে অবশ, এলাইয়া যেমন পড়িয়া থাকিত সেইরূপই। কিছু সময় পর জানলার কাছে আসিয়া উহাদেরই একজন মা বলিয়া ডাকিল। ডাক পাওয়া মাত্র এই শরীর বাতাসে উড়াইবার মত উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং শরীরটি ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহারা আসিয়া আমাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে দরজা খুলিয়াই আমি দাঁড়ান অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছি। মাথায় রক্ত দেখিয়া তাহারা এ শরীরের মাকে ডাকাইয়া আনিল। মাথায় জল দিল এবং আমাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক পরে আপনা হইতেই উঠিলাম। লোকজন কাছে বসা সারা কাপড়ে জল রক্ত, মাথা ভিজা — এসব আস্তে আস্তে চোখে পড়িতে লাগিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা।

আমি ভোলানাথের নিকট গেলাম। দেখি তাহার জ্বর বাড়িয়াছে। কে বলিয়া উঠিল, তুমি সেমিজ কাপড় ছাড়িয়াছ, আবার দেখি পিঠের উপর রক্ত। সে মাথার কাপড় খুলিয়া দেখিল মাথার এক জায়গায় কাটিয়া গিয়াছে ও সে স্থান হইতে সূক্ষ্ম ধারায় রক্ত পড়িতেছে। চুল ও রক্ত জমিয়া জড়াইয়া আছে। মাথা পরিষ্কার করিয়া দিল। পরদিন ভোলানাথের ডাক্তার আসিলে আমার মাথা দেখাইল। সে বলিল — তালুর দিকে আহত স্থানটি ফোড়ার মত নরম হইয়াছে। ২/৩ দিন পরে আমার মাথার ঐ জায়গাটি অস্ত্র করিতে হইবে বলিয়া এক ডাক্তার ছুরি ইত্যাদি লইয়া আসে। শশাঙ্কবাবু বলিল খুলির হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অস্ত্র করিলে কিরূপ

দাঁড়ায় ভয় হয়। আমি বলিলাম — তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর। তখন ঠিক হইল যে অস্ত্র করিয়া দরকার নাই। ক্রমে ক্রমে তাহা সারিয়া গেল।

ভোলানাথের অবস্থা প্রায় এক রকমই চলিতেছে। একদিন একটা দেড়টার সময় সিদ্ধেশ্বরী আসনে যাইব। শরীরের মা বলিলেন — আজ এত সকালে কেন? বলিলাম — সময় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি একটু চিন্তিত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন আসিয়া পড়িল। কথাবার্তা চলিতেছে। দেখি কি আমার খুব জ্বর হইয়াছে। হঠাৎ আমি খুকুনীকে বলিয়া উঠিলাম, দরজা বন্ধ কর, বমি হইবে। বমি হইল।

সন্ধ্যার সময় বাহিরে গেলাম। দেখি হাঁটিতে পারি না। বেড়া ধরিয়া ধরিয়া শরীর চলিতে লাগিল ও বাহিরে যাইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। খুকনী আবার ধরিয়া আনিয়া শোয়াইয়া রাখিল। দেখি কি, ভাত বসাইলে যেমন মুখের হাল্কা ঢাকনীটি ভাতের ফেনার সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে উঠে ঠিক সেইরকম মাথার তালুর মধ্য হইতে হাড় মাংস ভেদ করিয়া ঐ রকম একটা ভাব উপর দিকে উঠিতে চায়। এই রকম অবস্থা বোধ হইতে লাগিল যেন এ মুহূর্তে শরীর ছাড়িয়া যাইবে। তখন ঐখানে যাহারা ছিল তাহাদিগকে বলিলাম — শীঘ্র এ শরীর ধরিয়া বারান্দায় নাও। তাহারা তাহাই করিল। শ্বাস ত জোরে জোরে চলিতে লাগিল। শরীরের গতি অনুসারে যেরূপ ভাবে ক্রিয়া হয় সে ধরণে আমাকে উঠাইতে, বসাইতে ও শোয়াইতে বলিলাম। সমস্তগুলি যৌগিক আসন হইয়াছিল। পরে শুনিয়াছি যাহারা এ শরীর ধরিয়া এইরূপ করিয়াছিল, তাহারা ভয় পাইয়াছিল। কাহারো ইহাও আশঙ্কা হইয়াছিল, যেইরূপ ভাবে শরীরের ক্রিয়া, পাছে না কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া ভয়ানক চোট লাগে। এইরূপ অবস্থায় শরীর না ছাড়িয়া যায়। ইহার পরে ঘরে নিতে বলিলাম। সর্বাঙ্গ অবশ। সকলে বলিতে লাগিল প্যারালিসিস্ হইয়াছে। বাহ্য প্রস্রাব করাইতে সকলে ধরিয়া বাহিরে আনে। মাথা কেহ না ধরিলে হয়ত পিছনে না হয় সামনে অথবা পাশের দিকে হেলিয়া পড়িয়া যায়। যখন বসাইত মাথা ২/৩ জন ধরিয়া থাকিত। নবজাত শিশুর যেমন ঘাড় ঠিক সিধা থাকে না ধরিয়া রাখিতে হয় সেই রকমটা। সকলেই ব্যস্ত কিন্তু আমার খেয়াল হইতেছিল মহানন্দে এই এক কীর্তন

চলিতেছে। শরীরেও সে আনন্দ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই অসাড় অবস্থার ভিতর বলিয়া দিতাম, কোথায় পিঁপড়া, মাছি বসিল, আঙ্গুলটা কোথায় বাঁকা হইয়া গেল এবং কি ভাবে শরীরের কোন জায়গায় কি করিতে হইবে।

এইভাবে ৪/৫ দিন চলিলে একদিন পাশ ফিরাইয়া দিতে দিতে খুকুনী কাতর ভাবে বলিল — মা, আর এ শরীর আমরা চালাইতে পারি না। ঐ কথা বলার পর হইতে দেখিলাম রাত্রে শুইয়া আছি, পা গুলি নড়িয়া উঠিল এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব শরীর নিয়মিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু জ্বর ছাড়ে না। উহারা মাথায় জল ঢালার কথা বলিল। ৪/৫ দিন ধরিয়া রোজ এই খেলা চলিল। বেলা ১০/১১টা হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে চার পাঁচটা পর্যন্ত ৬০/৭০ বালতির বেশী জল ঢালা হইত। যাহারা এই সেবা করিয়াছিল তাহাদের ভিতর কাহারো জ্বর, কাহারো গা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিল। ভূপতিবাবু থার্মোমিটার দেয়, কিন্তু অতি অল্প সময়ের ভিতরই ১০৪°, ১০৫°, ১০৬° পর্যন্ত নানা রকম দেখা যায়। পরে থার্মোমিটার দেখা বন্ধ করিয়া দিল।

চুল লম্বা ছিল, ভিজা ও গন্ধ থাকে বলিয়া বলাতে, কাটিয়া দিবার কথা বলিলাম। খুকুনী কাটিয়া দিল। অসুখ বাড়িতে লাগিল। পায়ে, গায়ে শোথ দেখা দিল। ইতিমধ্যে ভোলানাথের অসুখ সারিয়া গেল। ভোলানাথ ব্যস্ত হইয়া আমার অসুখের কথা বাহিরেও জানাইল।

জ্যোতিষের বাড়ীতে ভগবান ব্রহ্মচারী পূজা করে, ভোলানাথ তাহা দেখিতে যায়। জ্যোতিষকে সিদ্ধেশ্বরীতে আসিতে বলে। গিরিজাও আমাকে দেখিয়া জ্যোতিষকে প্রত্যহ খবর দিত। একদিন দুপুরে জ্যোতিষ আসিল। আমাকে দেখিয়া চিন্তিত হইয়া বিকালেই পূর্ণ কবিরাজকে নিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম — এ শরীরের কি হইয়াছে? সে বলে অসুখ হইয়াছে, ঔষধ খাইতে হইবে। তাহাকে বলিয়াছিলাম — আচ্ছা! যদি চিকিৎসা করি তোমাকে ডাকিব।

দেখিতাম এ শরীরের কোন পরিবর্তন হয় নাই। পূর্বে হাঁটিয়া বসিয়া, শুইয়া যেমন থাকিতাম, এখন শুইয়াও তেমন আছি। খেয়ালেই আসিত না যে, আগে ভাল ছিলাম, এখন অসুস্থ হইয়াছি। সকলে মিলিয়া যখন ছুটাছুটি করিত, ব্যতিব্যস্ততা দেখাইত, তখন

দেখিতাম ইহাও যেন আনন্দের কীর্তন চলিয়াছে। শরীরেও ঐরূপ ভাবের প্রকাশ পাইত। এ কারণে আমার প্রায় হাসি বাহির হইত।

ভোলানাথ একদিন বলে — এইরূপ হাসিয়া মানুষকে দেখাও বুঝি যে তোমার কোন অসুখ জ্ঞান নাই। তোমার এইসব আমার ভাল লাগে না। যখন হাসিতাম, তখনই এ ধরণের কথা বলিত। একদিন এইরূপ বলাতে, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম — আচ্ছা, চুপ থাকিব। সেইদিন হইতে আর হাসি বাহির হইত না।

একদিন রাত্রে ভোলানাথ সকলকে সরাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে আমার হাতে পায়ে ধরিয়া বলে যে, তোমার অসুখ, তুমি ভাল কর। তোমার ইচ্ছা না হইলে কেহ তোমাকে ভাল করিতে পারিবে না। বলিলাম — আমি ত বেশ আছি। ভোলানাথ বলে — ভয়ানক অসুখ। তুমি বুঝ না। তোমার হাসি দেখিয়া সেইদিন আমি ঐকথা বলিয়াছিলাম। অন্যায় হইয়াছে, ক্ষমা কর।

বলিলাম — শরীরটা নিয়াই ত তোমাদের যত গোলমাল, বেশ ত একভাবে পড়িয়া আছে, ভালই ত। যদি শরীরটা তোমাদের দৃষ্টিতে যায়ও তাহাতেও বা ক্ষতি কি? আপনা হইতে যাহা হয় হইতে দেওয়াই ত ভাল। কাকুতি মিনতি করিয়া ভোলানাথ বলিল — তোমাকে আর কোন ভাবে বাধা দিব না, তুমি ভাল হও। তুমি ইচ্ছা কর, ভাল হওয়ার জন্য। বল, ইচ্ছা করিবে? বলিলাম — আচ্ছা, যদি ভাব আসে যে অসুখ করিয়াছে ও তাহা ভাল হওয়া দরকার, তবে করিব।

পরদিন ভোরে উঠিয়া বলিলাম — আজ ভাত খাইব। এইরকম অবস্থায় ভাত খাইবে কি? সকাল হইতেই আমার খেয়াল হইতে লাগিল যে আমি নাকি অসুস্থ হইয়াছি, তাহাদের দৃষ্টি মত ভাল হইতে হইবে। অসুখ সারিয়া উঠিলে রুগী যে যে পথ্য করিয়া থাকে, সেই রকম পদে রান্না করিতে বলিলাম। রান্না হইলে সকলে আশেপাশে ধরিয়া বসাইল, মুখে ভাত দিতে লাগিল। ভাত গিলিতে পারি না, পড়িয়া যায়। কোনমতে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলাম ও শুইয়া পড়িলাম। ক্রমে ক্রমে শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল।

রোগ সম্বন্ধে মায়ের খেয়াল

যেইবার চাঁদপুর হইতে ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী আসনে গেলাম, তাহার প্রায় ৮ বছর পূর্বে নিজের মুখেই বলি নিজেই শুনি যে, ৩৪/৩৫ বৎসর বয়সে এই শরীরের গতি পরিবর্তন হইবে। সে সময় আপন খেয়াল অনুসারে বিশেষ যোগক্রিয়া দ্বারা যোগী যে শরীর রাখিয়া দিতে পারে, যোগবলে শরীর ছাড়িতেও পারে, শরীর ভাল করিতেও পারে, তাহার ক্রিয়াদি এ শরীরে প্রকাশ হইবে। সিদ্ধেশ্বরীতে যে অসুখ হয় তাহারই ৮ বৎসর পূর্বে এই কথা বলা হইয়াছিল। যখন হরিদ্বার হইতে বেনারস আসি, তখন নির্মলবাবুর বাড়ীতে একদিন রাত্রে শুইয়াছি, ইহার ভিতর হঠাৎ বলিয়া উঠি যে — আর ৬৫ দিন বাকি। এই কথা সেখানে যাহারা শুনিল, তাহারা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু মুখে কোন জবাব বাহির হইল না। ননী সেখানে লিখিয়া রাখিল। পরে যখন অসুখ হয় সে নাকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল যে ঠিক ঐ তারিখের সঙ্গে মিলিয়াছে।

ভাত খাওয়ার পর ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছি। একদিন দ্বিপ্রহরে শুইয়া আছি, দেখি আমার বাম পার্শ্বে ঐ জ্বরের মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ শরীরে আসিতে চায়। আমি বাম হাত দিয়া ধরিলাম, চক্ষু মেলিয়া হাসিলাম। খুকুনী কাছে বসিয়াছিল। সে ইহা দেখিয়া বলিল — মা! বাম হাত উঁচু করিলে কেন? তোমার হাতে কি আছে? বলিলাম — আমার হাতে জ্বর। সে বলে — আবার জ্বর কি? বলিলাম — এখনই জ্বর আসিবে। এই দেখ বাহিরে প্রকাশ হইবার বেশী বাকি নাই। দেখিল গা একটু গরম এবং বলিল — যখন বলিয়াছ একটু হইলেও হইবে। আমি বলিলাম — সে আপনা হইতে আসিয়াছে তাহাকেই বা তাড়াইয়া দিই কেন? তাহার ভোগ যদি হিংসা কর, তবে তাহাকে রোগ বলিয়া দূর করিয়া দিবার ইচ্ছা, তাহাও ত তোমাদের শরীরের হিংসা ও পরিত্যাগ বাসনা। এ শরীর কাহাকেও ডাকিয়া আনে না, তাড়াইবার ভাবও আসে না। তোমাদের সকলকে নিয়া যেমন আনন্দের প্রকাশ দেখ, রোগকে নিয়াও কিন্তু তেমনি জানিবে। তোমরা যেমন ইচ্ছা আস যাও, তাহারাও অবাধে আসা যাওয়া করুক না কেন? অসুখ রূপটা ত আর ইহা (বলিয়া শরীরটা দেখান হইল) বাদ দিয়া নয়

সবই যে ঐ। অসুখ ও ব্যারামের মানে কি? সুখ নাই, আরাম নাই। এ শরীরের যে আরাম ব্যারাম, সুখ ও অসুখের কোন প্রশ্নই নাই। সব সময়ই ঐ এক ভাব। কাজেই কোন গোলমালই নাই, ঐ সবের। মানে এটা ওটার একেবারে মূলোচ্ছেদ আর কি। আবার যা বল তাই। কোন অসুবিধা নাই।

এ শরীরের অসুখের সময় শরীরের সম্মুখে আসনে ত সূর্য উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত শনিবারের কীর্তন হইত। একদিন বিকেল বেলা ঐ কীর্তনে, বিছানায় পড়া অবস্থায় এই দুর্বল শরীর, যাহা না ধরিলে নড়িতে চড়িতে পারে না, কীর্তনের ভাবে উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিল, কতক্ষণ স্থির হইয়া রহিল।

ইহার ভিতর ভোলানাথের আবার সামান্য সামান্য জ্বর হইতেছে। শরীর ক্রমশঃ দুর্বল, ঔষধাদি কিছুই খায় না। আমার যে পরে আবার জ্বর আসিল, তাহাও একদিন পর একদিন হইতে লাগিল। ভোলানাথকে ঔষধ খাওয়ার কথা বলিলে বলে যে তুমি আগে ঔষধ খাও, আমিও খাইব। আমি বলি, আমার এত বড় অসুখ সারিয়াছে, জ্বরও আপনি চলিয়া যাইবে। তুমি ঔষধ খাও। কিছুতেই খাইবে না। তখন বলিলাম — আচ্ছা। আমি সামান্য একটু কুইনাইন মুখে দিলাম। ভোলানাথও চিকিৎসা আরম্ভ করিল।

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন — রমনা আশ্রমে মহালয়ার দিন কালী আনা হইল। আমরাও সকলে সেদিন সেখানে গেলাম। ভোলানাথের অসুখ ক্রমশঃই বাড়িতেছে, এমন কি পাশ ফিরাইতেও কষ্ট বোধ করে। এক ডাক্তার আসিয়া বলিল লিভার পাকিয়াছে। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে অস্ত্র করাও সম্ভব নয়। তাই ইনজেকসন দিয়া গেল। বলিল যদি পরিবর্তন না হয় তবে পরে অস্ত্র করা যাইবে। সেইদিন ভোলানাথ অসাড় অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কেহ কেহ ভাবিল ঔষধে বোধ হয় এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়, আসলে অবস্থাই খুব খারাপ। প্রায় ১২ ঘণ্টার পর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। অস্ত্র আর করিতে হইল না। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন আশ্রমের ছোট ঘরটির ভিতর একা শুইয়া আছি, দেখি কি জ্যোতিষের পূর্ব শরীর, সে ঘরের উত্তর দিকে আছে। পরে ভোলানাথ এই ঘরে আসিলে আমি উত্তর পার্শ্বেও থাকিতাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিল এই সব অসুখের কারণ কি ? তাহাদের বলিলাম — তোমাদের হিসাবে ত প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির যোগাযোগ আছে। আবার কোন যোগাযোগ বলিয়া কথাই নাই। ভোলানাথকে বলিয়াছিলাম, এ শরীরকে বাধা দিও না। বাধা দিলে এই শরীরের গোলমাল হইবে। প্রসন্নভাবে যাইতে দাও। ইহা শুনিয়া আমাকে যাইতে দিল বটে কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছা ও বাধা বিঘ্নের সহিত।

অসুখটা ত তোমাদের দৃষ্টিতে। এই শরীরের ত সুখ আর অসুখ দুইটাই সমান। তোমাদের নানা ভাবের মধ্যে আপনভাবে শরীরটা ত খেলিয়া যাইতেছে, এই আবার এক রকম হাসি খেলা মনে কর না। আর এই সময়ে যে শরীরের পরিবর্তন হইবে, নিজের খেয়ালে আগেও প্রকাশ হইয়াছিল। এই সত্য রক্ষার জন্য তোমাদের দৃষ্টিতে এই অসুখের প্রকাশ। যাহা পাকা খেয়ালে আসে তাহা অকাট্য হইবেই। এসব ত খেলা ছাড়া কিছুই না। এ শরীর নিয়া বেশ খেলা চলিতেছে বটে !

সাধনায় সাধকের শরীর

একটা অবস্থায় সাধক যদি তাহার কর্মে স্বাধীন ভাব না পায়, কাহারো আচরণ বা চরিত্র তাহার কর্মের ও ভাবের অনুকূল না হয়, তাহা হইলে বিঘ্নকারীদেরও অসুবিধা ঘটিয়া যাইতে পারে। সাধক যদি উন্নত হয় তবে সে নিজের উপর সব বিঘ্নাদি নিয়া অপরকে অব্যাহতি দিতেও পারে। আবার বিঘ্নকারীর গতিও ফিরাইতে পারে। আর উন্নত অবস্থায় যদি না থাকে তবে নিজের ক্ষতি হয়। ইহারও সামান্য একটুমাত্র বলা হইল। আরো যে কত রকম ভাব, কত রকম অবস্থা তাহার ইয়ত্বা নাই।

সাধারণতঃ তোরা মিনিট ঘন্টা, দিন, রাত্রি, মাস, বৎসর গুনিস। মিনিটের মধ্যে তোরা কত রকম বদলাইয়া যাইতেছিস। ছেলেদের খেলার মত এই শরীরটা সাময়িক সাধনার খেলা যখন খেলিয়াছিল, মিনিটের মধ্যে কত রূপ, কত ভাবের খেলা হইয়া যাইতেছিল। তোদের দিন রাত্রি ঘড়ি ঘন্টার হিসাব ওখানে কোথায় ? তোরা যে সবই কালের অধীন দেখিস, বলিস কিনা। ওখানে যে নাই কালাকাল, নাই দিবারাত্রি, নাই আলো, নাই অন্ধকার। যতক্ষণ নিয়ম ও বন্ধ ভাবের আশ্রয় ও অধীনে, অর্থাৎ বন্ধন, ততক্ষণ অবস্থা ও অনাবস্থার কথা, গতাগতি ও পরিবর্তন যা বলিয়া থাকিস। জগৎ মানে গতাগতি। বদ্ধভাব হইতেছে জীব। কথা হইল, এই যে স্বভাবে স্থিত হইবার জন্য রাস্তায় যে লক্ষণ প্রকাশ হইলে স্বাভাবিক ভাবে স্বভাবে স্থিতি প্রকাশ দেখা দেয়, সেইজন্য সাধককে তাহার আপনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া। অধিক বাধা পাইলে নিজের ইচ্ছানুসারে এ শরীরও ছাড়িয়া দিতে পারে, যদি সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়। সাধন অবস্থায় তাহাদের শরীর ইঞ্জিনের মত চলে কিনা। যেদিকে হয় সেইদিকেই চালাইতে পারে। বাধা পাইলে ইঞ্জিন আপনি বন্ধ হইয়া যাওয়ার মত দেখাইতে পারে। তেমন সাধক শরীর একেবারে জড় ভাবেও সাময়িক রাখিতে পারে। আবার তাহার কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। বাধাটা গ্রহণও তাহার স্বাধীন। এই হইল সাধকের কথা। এই শরীরটার কথা বাদ দে। তোদের পাগলা মেয়ের পাগলামি ত আলাদা।

প্রতিদিন মাঠে বেড়ানো

রমনা আশ্রমে ছোট ঘরে আসা অবধি এ শরীর প্রায় ১৫ দিন যাবৎ এক আসনে বিছানায় বসিয়া থাকে। আমারও খেয়াল নাই অন্য কাহারো খেয়াল হয় নাই যে আমি নড়াচড়া করি না। লোকজন আসে যায় বসিয়া কথা বলি, চলিয়া গেলে সেই বসা আসনেই কোন সময় শুইবার ভাবে থাকি। সামান্য যাহা খাওয়া ওখানেই হয়। এক বাহ্য প্রস্রাবের জন্য ২/১ বার যাওয়া কিন্তু হাঁটা একেবার হয় না। তাহাও সর্বদা ত নাই-ই।

ইহার মধ্যে কেহ একদিন বলিলে, বাহিরে যাইতেছি। খুকুনী বলে — মা ! তুমি এইরূপে হাঁটিতেছ কেন ? আমি বলিলাম — আমি ত ঠিক মতই চলিতেছি। সে বলে — না। তোমার পা ত ঠিকমত পড়ে না। আমি হাসি আর বলি কেন ! এই ত হাঁটিতেছি, আমি ত বুঝি এই রকমই আমার হাঁটা তখন খুকুনী বলিল — বসিয়া বসিয়া তুমি হাঁটাও ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি বুঝি হাঁটা বন্ধ করিয়া দিতে চাও ? এ সব কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে বলিতে দুঃখ প্রকাশ করিতে

লাগিল। জ্যোতিষ আসিলে তাহাকে বলিল — মা ত হাঁটিতে পারে না। এ কেমন হইল ? আমি তাহাদের কথা শুনি আর হাসি। আমি দেখি যেমন তেমনই আছি, বসিয়া থাকার দরুণ কোনরূপ মাজা ধরাও নাই, কোন অসুবিধাও বোধ নাই। পরদিন জ্যোতিষ খুব ভোরে আসিল। ভোলানাথ তাহাকে বলিল চল মাঠে বেড়াইয়া আসি। খানিকটা হাঁটিয়া আশ্রমে আসিলাম। ভোলানাথ এইরূপ ৩/৪ দিন জ্যোতিষ সহ আমাকে নিয়া মাঠে হাঁটাহাঁটি করার পর স্বাভাবিক অবস্থা আসিতে লাগিল। আমার স্বাভাবিক চলাফেরা দেখিয়া খুকুনীর খুব আনন্দ।

ভোলানাথের আদেশানুযায়ী জ্যোতিষ সেইদিন হইতে প্রত্যহ ভোর ৫টার সময় আসিয়া আমাকে মাঠে বেড়াইয়া আনিত। যতদিন ঢাকা আশ্রমে ছিলাম শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় একদিনও তাহার বাদ যায় নাই। কোনদিন বেলা ১০/১১ টায় রবিবার বা ছুটিতে বেলা ১টা পর্যন্ত ও আশ্রমে কাটাইত। তাহাকে কোন সময় আমার সামনে বসিতে বা বাহ্য প্রস্রাবের জন্য বাহিরে যাইতে দেখি নাই। রাত্রি ৪টার সময় বাসা হইতে প্রায় দেড় মাইল হাঁটিয়া আসিয়া মন্দিরে ঊষা আরতিতে যোগদান করিত। পরে আমাদের ঘরে আসিত।

একদিন তাহাকে সারাদিন হইতে রাত্রি পর্যন্ত দাঁড়ান দেখিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম ইহাও এক যোগক্রিয়া জানিবে। এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমার এক সাধনা হইয়া যাইতেছে।

আমি সকালে উঠিয়া বসিয়া থাকিতাম, অথবা সে আসিলেও উঠিতাম। ঝড় বাদল কুয়াশা কি শারীরিক অসুখ, এমন কি ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও তাহাকে একদিনের জন্যও এই নিত্য কর্মে বাধা দিতে পারে নাই।

জ্যোতিষকে যজ্ঞোপবীত দান

একদিন বেড়াইয়া আসিয়া ঘরে বসিয়াছি। ভোলানাথও আছে। যজ্ঞোপবীত ব্যবহার সম্বন্ধে কি প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। তখন আমি যে সোনার হারটি পৈতার মত গলায় দিতাম তাহা খুলিয়া বলিলাম — এই দিকে আয়, আমি তোকে আজ এ পৈতাটি পরাইয়া দিই। আজ হইতে জানিস্ — তুই ব্রহ্মচারী। সে হারটি পরিয়া জলভরা

চোখে বলিল — আমার কি সাধ্য আছে যে ইহার সম্মান করিতে পারি তবে আপনি দয়া করিয়া যাহা করান, তাহাই প্রাণপণে চেষ্টা করিব, সেইদিন হইতে প্রায় ৩ বৎসর ঐ হারটি তাহার গলায় ছিল। পরে একটি সুতার পৈতা তাহাকে পরাইয়া ঐ হারটি আমি নিয়াছিলাম ও পরে ঢাকা হইতে দেরাদুনের দিকে আসিবার সময় খুকুনীর গলায় দিয়া বলিলাম সকালে বিকালে নিয়মমত গায়ত্রীর সহিত সন্ধ্যা বন্দনা করিও।

সিদ্ধেশ্বরীতে পাঁঠাবলি উপলক্ষে

একদিন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে পাঁঠাবলির সময় রক্ত দেখিলাম। তাহার পর কেমন একটা ভাব, যেদিকে তাকাই কেবল রক্ত মাংসের খেলা। জল মাটিও রক্ত। গাছ কাটিলে যে রস বাহির হয়, তাহাও সজীব যেন গাছটির রক্ত। ফলটা মাংস হাড় রক্ত জড়িত জীবন্ত ইত্যাদি অনেক রকম লাগিত। যদিও সব সময় লাল রং দেখিতাম না, কিন্তু ঐ যে জীবন্ত একটি হাড়, রক্ত ও মাংসের ভাব, তাহা সকল সময় লাগা থাকিত। কেহ কোন ফল কাটিলে বোধ হইত আমার শরীরটা কাটিতেছে। কেহ কোন গাছ কাটিলে রস পড়িতেছে দেখিলে খেয়াল হইত আমার গায়ের রক্ত পড়িতেছে। দুধও রক্ত, এ শরীরটাও রক্ত মাংস এরকম খেয়াল আসিয়া পড়িত।

এইরূপে ভাবান্বিত হইয়া কিছু খাইতে গেলে কেমন হইয়া যাইতাম। কয়েকদিন পর্যন্ত কিছু খাওয়াও হয় না। খাওয়ার ভাবও আসে না। জ্যোতিষ আসিয়া একদিন বলে, এইভাব চলিলে ত শরীর টিকিবে না। আপনি ত এইসব নিয়া বেশ এক আনন্দে আছেন কিন্তু ইহা শরীর থাকার লক্ষণ নয়। আমি বলিলাম — এ শরীরের ত থাকা না থাকার প্রশ্ন নাই। বেশ একটা খেলা চলিয়াছে। অর্থাৎ সবই চৈতন্যময়। আপনা হইতে যাহা হইবার হইতেছে। তবে কিনা দেখ, আমরা নিজেকেই নিজে খাইতেছি জানিবে। জীব জীবকে খাইয়া তাহার জীবত্ব রক্ষা করে। তাই বলিতে হয় যে নিজে নিজেকে সৃষ্টি করে, স্থিতি করে আর লয় করে — নিজেতেই নিজে। দেখ গাছ লাগাইয়া রক্ষা করা হয়,

আবার ইহার ফলাদিও খাওয়া হয়। ইহাতে জানিবে সকল শক্তি ও সবই সবেতেই নিহিত রহিয়াছে। সব শক্তি সবখানে পূর্ণভাবে আছে। আধ্যাত্মিক জগতে যাহারা সৃষ্টি স্থিতি লয়ের আসল বীজটিতে একবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহারা ঠিক এই রূপে জাগতিক, আধ্যাত্মিকে ঐ দৃষ্টিতে খেলিয়া যায়। আবার দৃষ্টি সৃষ্টির কোন প্রশ্নই নাই। এইরূপ অনেক কথা হইল।

জ্যোতিষ বলিল — আপনি যখন স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে একই আছেন, আপনার সব কথাতেও তাহা বুঝা যায়, তবে আমরা চাই আপনি নিজেই নিজেতে থাকুন আর আমরাও যেন আপনাকে ব্যবহারে পাই। মোট কথা, আপনার শরীর রক্ষা আমাদের জন্য দরকার। আমি বলিলাম — তোমাদের প্রবল ইচ্ছা হইলে আর এ শরীরের খেয়াল হইলে আপনা হইতে তাহা হইয়া যাইবে। পর-ইচ্ছা, স্ব-ইচ্ছা, অনিচ্ছা তার খেয়ালে সবই গ্রহণ ত্যাগ। এই ভাব কয়েকদিন বেশ চলিয়াছিল পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল।

ধর্মপুত্ররূপে জ্যোতিষ

ভোলানাথ সিদ্ধেশ্বরীতে একলা থাকিয়া জপ তপ করে। আমি রমনা আশ্রমে আছি। এইরূপে ১৫/২০ দিন চলিতেছে। জ্যোতিষ অফিস হইতে যাইয়া প্রায় ভোলানাথকে দেখিয়া আসে। একদিন তাহার মুখ দিয়া আবার রক্ত পড়িয়াছে শুনিয়া ভোলানাথ তাহাকে ইঙ্গিত করিল যে পরদিন সকালে যেন আমাকে লইয়া সিদ্ধেশ্বরী যায়। তখন ভোলানাথ কয়েকদিনের জন্য কথা বন্ধ করিয়াছিল। পরদিন জ্যোতিষ আমাকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী গেল। জ্যোতিষ, ভোলানাথ আসনে বসিয়া আছে। আমিও যাইয়া এক পাশে বসিলাম। আসনে একটি স্তম্ভের মতন ছিল ও চারিদিকে কাঠের রেলিং ছিল। শিব প্রতিষ্ঠা তখনো হয় নাই। ভোলানাথ আমাকে নিকটে ডাকিল, আমি রেলিং ধরিয়া খাড়া হইলাম। ভোলানাথ জ্যোতিষকে ডাকিয়া নিকটে বসিতে বলিল। সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। ভোলানাথ আমাকে তাহার রক্ত পড়ার কথা জানাইল, জ্যোতিষও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল। আমি খাড়া হইয়া শুনিতেছি। দেখি জ্যোতিষের ব্রহ্মতালু

হইতে কপাল পর্যন্ত মেরুদণ্ডের মত একটি চিহ্ন ; উঁচু ও বড় হাড়ের মত। তাহা আমি ভোলানাথকে দেখাইলাম ও নিজে ধরিয়া দেখিলাম। ভোলানাথও দেখিল। তখন মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল — এই সব যৌগিক চিহ্ন। এই চিহ্ন যাহার, তাহার ধর্ম-চিন্তা স্বাভাবিক।

ভোলানাথ জ্যোতিষকে ইসারায় বলিল, তুমি গায়ের জামা খুলিয়া ফেল। সে তাহা করিল। আমি ভোলানাথের নিকট বসিয়া আছি। ভোলানাথ করিল কি, কেমন এক অস্বাভাবিক ভাবে জ্যোতিষের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া তাহাকে ছেলেমানুষের মত শূন্যে ঘুরাইয়া আমার কোলে আনিয়া বসাইয়া দিল ও বলিল — জ্যোতিষ তোমার ধর্মপুত্র, তাহাকে এই আসনে তোমার হাতে দিলাম। তোমার তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তাহার এই অসুখ যেন সারিয়া যায়। এই রোগে তাহার যেন মৃত্যু হয় না। উহার দিকে সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি। সেও যেন একটি শিশুর মতন একটু সময় বসিয়া রহিল। আঁখি ছল ছল। পরে সে উঠিয়া আসিল। যখন দেরাদুনের দিকে আসা হইল, লোকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম — ধর্মপুত্র। তাই সেই স্থানের লোকেরা তাহাকে ভাইজী বলিয়া ডাকিত।

পরদিন সকালে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে জ্যোতিষ বলিল — মা! আমার কি সৌভাগ্য! বাবা ও মা'র হাত আমার মাথায় পড়িল। বাবা আমাকে ছেলের মত গ্রহণ করিলেন ও আপনার কোলে দিলেন। আমার মত অধমের প্রতি আপনাদের যে এত কৃপা হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! আরো বলিল যে এই শুভ মুহূর্তের স্মৃতিস্বরূপ ফটো তুলিতে ইচ্ছা করে, আমার এই একটি নিবেদন। মা! ভোলানাথ ত কোলে দিয়াছেন। এ শরীর বলিল — তোর যখন ইচ্ছা হইয়াছে, ভোলানাথকে বল্। এ বিষয়ে এ শরীরের ত কিছু বলা আসিতেছে না। ভোলানাথের অনুমতি লইয়া ফটোগ্রাফার বীরেন সোমকে দিয়া সিদ্ধেশ্বরী আসনে পূর্ব দিনের ধরণে ৩ রকমের ৩ খানি ছবি তোলা হইল। ছবি তোলা হইলে বীরেন সোম বলিয়াছিল জ্যোতিষবাবু, আপনার কি সৌভাগ্য। আমারও কত সৌভাগ্য যে আমি এই রকম ছবি তুলিতেছি। ছবি তৈয়ার হইয়া আসিলে সে বলিল — 'এ ছবির মর্ম বুঝিবে

কয়জন ?' সিদ্ধেশ্বরী ঘরের ভিতর যে আসন তাহার ছবি একখানি। ভোলানাথ ও এ শরীর যে জ্যোতিষের মাথায় হাত দিয়াছিল সেইখানি দ্বিতীয় ছবি। আর ভোলানাথ যে জ্যোতিষকে ছোট্ট ছেলের মত এই শরীরের কোলে দিয়াছিল, সেইখানি তৃতীয় ছবি।

প্রায় ৫/৬ মাস পর সেই ছবির কথা উঠিলে সে আবার বলিল — এ ছবি দেখিবে কে ? বুঝিবে কে ? এ শরীর বলিল — কেন, মা (জ্যোতিষের স্ত্রী) দেখিবে। সে বলিল — সে সৌভাগ্য আমার নাই।

সে সময় এ শরীর তাহাকে বলিল — দেখ, এখন খেয়াল হইল। তোমার যখন খুব খারাপ অবস্থা নিরঞ্জন আমাদিগকে হরিদ্বারে তার করিয়াছিল। সে তার হৃষীকেশে যাইয়া পাওয়া যায়। তখন দেখা হইয়াছিল, তোমার খুব রুগ্ন অবস্থা, ছোট্ট শিশুর মত ভাব, এ শরীর কোলে করিয়া বসিয়া আছে, এবং মা (জ্যোতিষের স্ত্রী) আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। এ শরীর তখন ভোলানাথকে এই কথা জানাইয়াছিল যে — এইবার জ্যোতিষের মৃত্যু হইবে না। ভোলানাথও তাহাই বলিল। এ যাবৎ এ সব কথা খেয়ালই ছিল না। আজ ৪/৫ বছর পর ভোলানাথ তোমাকে ছেলেমানুষের মত কোলে দিয়া, কোলে দেখাটা কেমন করিয়া থাকিল। পরে ভোলানাথকে এইসব কথা বলিলে বলে — 'তাই ত। আমার ত এই সব কথা মনেই ছিল না। কেবল উহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য তোমার কোলে দেওয়ার কথা আমার মনে হইয়াছিল।

শকুনকে প্রসাদ দান

একদিন মাঠে হাঁটিতে হাঁটিতে একটি পুকুরের পাড়ে কতকগুলি শকুন চোখে পড়িল। জ্যোতিষকে বলা হইল — ইহাদিগকে কিছু খাবার দে। মাংস ছাড়া ত কিছু খাইবে না। একদিন প্রসাদের ব্যবস্থা কর। বিষ খাইলে বিষের যেমন ক্রিয়া হয়, প্রসাদের দ্বারা ইহাদের ভিতরও কিছু হইবে। সে বলিল — আপনার যখন মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, নিশ্চয়ই এগুলিও প্রসাদ পাইয়া মুক্ত হইবে। এ শরীর বলিল — তোমরা যেমন সর্বসাধারণ জীবের কথা বল — উহারাও রকমভেদে আসলে জীবই ত। তোমরাই ত বল — যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী — সরল সহজ ভাবে সেইভাব রাখিতে চেষ্টা করিও।

পরে একদিন রমনা কালীবাড়ীর প্রসাদ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উহারা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ উল্লাসে চেঁচামেচি করিয়াছিল। তাহার পরের দিন সকাল বেলার দিকে দেখা গেল বহু শকুন আশ্রমের দেওয়ালের উপর ও মাঠে বসিয়া চড়িয়া ফিরিয়া বেশ কিছুক্ষণ ওখানে মহা আনন্দে ছিল। অনেকেই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছিল। প্রসাদ আশ্রম হইতে বহুদূরে ময়দানে দেওয়া হইয়াছিল ত, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শকুনগুলি পরদিন আশ্রমের দেওয়ালে আসিয়া বসিল যেন মন্দির ইত্যাদি দর্শনে আসিয়াছে। রমনার কালীবাড়ীও ত নিকটেই ছিল কিন্তু ওখানে একটিকেও দেখা গেল না।

আশ্রমে পঞ্চবটী

একদিন দক্ষিণাঞ্চলে ঘুরিবার প্রস্তাব হইলে শশাঙ্কবাবু, কুঞ্জবাবু, খুকুনী, যোগেশ, আশু, এ শরীরের পিসি সহ আমি ও ভোলানাথ বাহির হইলাম। ওয়ালটেয়ার হইতে রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা ইত্যাদি দক্ষিণের বহু স্থান ঘুরিয়া বিন্ধ্যাচলে পূজায় আসা হইল। পরে সেখান হইতে ঢাকা আসা হয়। শশাঙ্কবাবু ও খুকুনী, দেখা হইবার পর হইতেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত।

একদিন কথায় কথায় আশ্রমে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। ভোলানাথ সব গাছ সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রপূত ও ক্রিয়াদি করিয়া লাগাইল। কিছুদিন পরে অশোক গাছটি শুকাইয়া গেল। সকলের ধারণা মরিয়া গিয়াছে, ভোলানাথ বলে উহা নিশ্চয় বাঁচিবে। অনেক যত্ন করিতেছে। ইহার মধ্যে কমলাকান্ত একদিন সে স্থান পরিষ্কার করিতে যাইয়া সেখানে অশোক গাছটি শুক্না দেখিয়া উঠাইয়া ফেলিয়া দিল। তাহা আবার আনিয়া নানা রকম ক্রিয়াদি দ্বারা ভোলানাথ লাগাইয়া বলিল নিশ্চয়ই বাঁচিবে। এই শরীরের কথার সঙ্গে একটি নূতন চারাও লাগান হইল। পরে দেখা গেল, পুরানো গাছটিও বাঁচিয়া উঠিল।

এক যুবক সন্ন্যাসী

আমরা কলিকাতা গিয়াছি। যারা আসা যাওয়া করে তাহাদের বাসায় বাসায় কীর্তন হইতেছে। একদিন সুরেনবাবুর বাসায় কীর্তন। দেখিলাম দূরে একটি গেরুয়া পরা যুবক দাঁড়াইয়া আছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেইদিন সে কীর্তনে ছিল। পরে শুনিলাম, কয়দিন হইতেই কীর্তনে এ শরীর যেখানে যায়, সেও সেখানে উপস্থিত থাকে। পরদিন দেখি একটি স্ত্রীলোক, দুইটি ছোট মেয়ে ও একটি ছোট ছেলে সঙ্গে নিয়া এ শরীরের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত। বলে যে আমার এ শিশু দুটিকে ফেলিয়া তাহাদের বাবা বাহির হইয়া গিয়াছে। আমার এখন উপায় কি? তখন গেরুয়া পরা যুবকটিও সেইখানে আসিল। জানা গেল ইহারা তাহারই স্ত্রী ও সন্তান। সে বলিল — আমি বেশ ভাল চাকুরি করিতাম ও ইহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। ইহার মধ্যে বড় মেয়েটি হইল, তাহার উপর আমার প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়া গেল। পরে ছোট মেয়েটি হইল। হঠাৎ আমার ভিতর একদিন এই বিচার আসিল যে সত্যই কি আমি বড় মেয়েটিকে ভালবাসি। আচ্ছা, সত্য ভালবাসা কি জিনিষ তাহা দেখিতে হইবে। আমার মনের গতি অন্যরকম হইয়া গেল ও স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিলাম। আজ ৮ মাস পর্যন্ত বাহিরে বাহিরে আছি। ২ মাস হইল গেরুয়া নিয়াছি। স্ত্রী কিছুতেই এসব মানে না। এখন আমি কি করি বলুন। তাহাকে বলিলাম — উপস্থিত তাহাকে তোমার শান্ত করা দরকার। সে বলে — আমি ত বসিয়া আছি, কিন্তু তাহারা আমার মন ফিরাইয়া দূরে নিয়া যায়। আমি কি করিব? তাহার বাপের অবস্থা ভাল, তাহার খাওয়া দাওয়ার ত কোন অসুবিধা নাই। স্ত্রীটি অজস্র কাঁদিতে লাগিল। পরে তাহারা চলিয়া গেল। আমি দিনে এক বাসায় বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি সেখানেও যুবকটি সকলের পিছনে বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি তাহার স্ত্রীও দুইটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়া উপস্থিত। সে বলে, এ দুইটিকে আমি এখানে রাখিয়া চলিয়া যাইব। যুবকটি বলে — দেখুন কাল রাত্রিতে বেশ বুঝিয়াছিল। আবার আজ সে কেন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে বলিলাম — না, বুঝে নাই। বুঝিলে কি আর আসিত। তুমি তাহাকে এখন ত উপস্থিত সঙ্গে লইয়া গিয়া সান্ত্বনা দাও।

আমরা কলিকাতা হইতে পাবনা প্রাণকুমারের বাসায় গেলাম। সেখানে দেখি ঐ যুবকটিও আমাদের সঙ্গেই গিয়াছে। আমার কাছে আসিত না বা কোন কথাবার্তা বলিত না; দূরে দূরে থাকিত। সে সেখানেই রহিল। পাবনায় কীর্তনাদিতে কয়দিন বেশ কাটিল, পরে আমরা কলিকাতা চলিয়া আসিলাম।

ঘুরিয়া ফিরিয়া কক্সবাজার আসিলাম। কয়েকদিন সেখানে আছি। সমুদ্রের পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াই। একদিন হইল কি, আমি একস্থান হইতে মাটি সরাইয়া গর্তের মত করিতে লাগিলাম, খুকুনী বলে — কি করিতেছ? আমি বলিলাম — এ শরীরের জায়গা করি। সে বলিল — এইসব কি যে বল? আমি বলিলাম — সবই ত আমার শরীর। সে বলিল — নিশ্চয় কোথায় কিছু ঘটিয়াছে। আমি কেবল হাসি, মুখে কিছু বাহির হইল না। ইহার পর পাবনা হইতে চিঠি গেল যে ঐ ছেলেটির জ্বর খুব বেশী, তাহার আপনার জন কোথায় কেহ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলে না, সে চুপ করিয়া থাকে। অন্য সব কথা বলে। কয়েকদিন পরে কক্সবাজারে পাবনা হইতে এক চিঠি আসে যে সেই যুবকটি মারা গিয়াছে। তাহার স্ত্রী পাবনা যাইয়া তাহার মৃতদেহটি দেখিতে পাইয়াছিল। দেখা গেল, যেইদিন এই শরীর সমুদ্র পাড়ে গর্ত করিতেছিল, সেইদিনই সেই সময় তাহার দেহ-ত্যাগ হয়।

কালীমূর্তির অঙ্গে আঘাতে মায়ের শরীরে প্রতিক্রিয়া

কক্সবাজারে একদিন বলি — যে আমার হাত খানা মটকাইয়া ভাঙ্গিব, কাটিয়াও ফেলিতে পারি। ইহা বলিয়া আমি হাসিতেছি। একটু অস্বাভাবিক ভাব। খুকুনী বলে — তুমি এইসব খেয়াল করিও না ত। আবার কোথায় কি গোলমাল বাঁধে। কয়েকদিন পরে ঢাকা হইতে খবর গেল যে আশ্রমে কালীর হাত মচকাইয়া ভাঙ্গিয়া সামান্য একটু কাটিয়া সোনার অলংকার যা ছিল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কয়েক মাস পরেই নূতন মন্দিরের ভিত্তি পত্তন হয়। পরে ঢাকা ফিরিয়া আসিয়া পবিত্র ভাবে কালীর হাত মেরামত করিয়া লওয়া হয়।

ঢাকা আশ্রমের নীচে সমাধি

যখন নূতন মন্দিরের ভিতটি করিবার জন্য গর্ত করা হয়, তখন অনেক সমাধি বাহির হইয়া পড়িল। সেইজন্য মন্দির বড় করা হইয়াছে। প্রায় ৩/৪টি সন্ন্যাসীর সমাধি এই মন্দিরের নীচে আছে। সমাধির দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখিলে দেখা যায় ইহারা খুব বলিষ্ঠকায় এবং কেহ কেহ পশ্চিমাঞ্চলের লোক। সে সমাধি স্থানগুলি আবার সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইল।

কীর্তনে যোগেশের সহিত মায়ের লীলা

সাহবাগে একদিন কীর্তন হইতেছিল। যোগেশ প্রায় আসে, গান করে, কিন্তু কীর্তনে বিশেষ যোগ দেয় না। ইহার মধ্যে একদিন কীর্তনে এই শরীরের পূর্ববৎ অবস্থা হইল। উঠিয়া যাইয়া সকলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। সকলে দাঁড়াইয়া কীর্তন করিতেছে কিন্তু যোগেশ বসিয়া আছে। ইহার ভিতর কেমন একটি ভাব হইল, সোজা যোগেশের পিছনের দিকে যাইয়া পিঠে এক পা ও শূন্যে এক পা দিয়া, শরীরটা টান হইয়া দাঁড়াইল। খুব হাসি বাহির হইতে লাগিল। পড়িয়া যাইতে পারে ভাবিয়া ভোলানাথ গিয়া তাড়াতাড়ি হাতের আঙুল ধরিল। কিন্তু তখন অস্বাভাবিক ভাব, মাথায় কাপড় নাই, চুল খোলা, এলোমেলো ভাব। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পরে কাঁধ স্পর্শ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। পরে ডান হাত উঠাইয়া বেশ এক লক্ষ্যে একটা চড়ের মত যোগেশের গালে গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ছেলেমানুষকে সান্ত্বনা দেয় সেইভাবে হাসিতে হাসিতে বাম হাত যাইয়া তাহার সেই গালটিতে বুলাইয়া দিল। পরে এইভাব আস্তে আস্তে পরিবর্তন হইল। যোগেশ কাঠের পুতুলের মত স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। শুনিলাম, যদিও এই শরীরের সম্পূর্ণ ভার যোগেশের উপর পড়িয়াছিল, কিন্তু যোগেশের নিকট খুব হালকাই মনে হইয়াছিল যেন একটি ছোট্ট শিশু। তাহার পর হইতে সে সব নামকীর্তনে যোগ দিত। তখন পর্যন্ত সে এ শরীরের নিকটেও আসিত না, কোন কথাও বলিত না।

যোগেশের ভিক্ষাবৃত্তি

জ্যোতিষের বাড়াবাড়ি অসুখের সময় খেয়াল হইল — যদি যোগেশকে এক বছর ঘর ভাড়া ও ভিক্ষা বৃত্তিতে রাখি, তবে জ্যোতিষের মঙ্গল হইবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কত রকম যোগাযোগ থাকে, এ বিষয়ে আর কিছু বলা আসিতেছে না।

একদিন ভোলানাথকে বলিলাম যে যোগেশকে বল ফাল্গুন মাসের ১লা তারিখ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কেশ মুণ্ডন করিয়া টাকা পয়সা শূন্য অবস্থায় ভিক্ষা বৃত্তিতে এক বৎসর ঘুরিয়া আবার ঐ তারিখেই যেন ঢাকা আসিয়া উপস্থিত হয়। যোগেশ যথাসময়ে বাহির হইয়া গেল। সেই বৎসরই পূর্ণকুম্ভ ছিল। আমরা যখন হৃষীকেশ স্বর্গদ্বার গেলাম, তখন ভোলানাথ আমাকে ডাকিয়া যোগেশকে সেখানে দেখাইয়াছিল। তাহাকে বলা হইয়াছিল, অজ্ঞাতবাস করিবে, জানাশুনা মানুষকে এড়াইয়া চলিবে। সে আদেশ সর্বতো-ভাবে পালন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকায় ফিরিয়া আসে।

বিনা জলপানে

একবার সাহবাগে কে কথায় কথায় বলিল — জল না খাইয়া কি মানুষ থাকিতে পারে না? ইহা শুনিয়া কি এক খেয়াল আসিয়া গেল। জল খাওয়ার আর ভাব নাই। এমন কি কিছু খাইলেও জল মুখে দিতাম না, মুখও ধুইতাম না। প্রায় ১৫ দিন এইভাবে চলিতেছে। একদিন বাহিরে যাইব জলের ঘটি দিলে দেখি, জল না কি খেয়াল নাই। জলের ব্যবহার একেবারে বে-খেয়াল হইয়া গিয়াছে। জল না কি অন্য জিনিষ তাহাই প্রকাশ হইতেছে না। তৎক্ষণাৎ বিচার আসিল যে ব্যবহার নাই তাই এইরূপ হইয়াছে। তখন ভোলানাথ, খুকুনী, অটল, কমলাকান্ত ও নন্দু সেখানে ছিল। তাহাদের ৫ জনকে বলিলাম — আমার মুখে তোমরা ৫ জনেই জল দাও। তাহারা জল দিল। প্রায় ১ ঘটি জল খাওয়া হইল। সে সময় অনেক রাত্রি পর্যন্ত কথাবার্তা হইত। তখনো রাত্রি বেশ আছে। জল খাওয়াইবার পর এ শরীরটা বাহিরে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলা হইল যে দেখ এখানে ৫টি পদ্মফুল পাইলাম। এত

রাত্রিতে কাহারো ত এখানে আসিবার কথা নয়। কোথা হইতে এ ফুল আসিল? ইহার ভিতরেও কথা আছে। তাহাদের বলিলাম তোমরা এক একটি নাও।

সাহবাগে থাকিতে আর একবার ২৪দিন জল খাওয়া হইয়াছিল না। সাধারণতঃ দেখা যাইত যে কিছুদিন পর্যন্ত একভাবে চলিলে পূর্বের ব্যবহারগুলি অদৃশ্য হইতে থাকিত।

তখন ডাবের জল দিলে এক ঢোক খাওয়া হইত, কেবল জল ভুলের মত না হয় এই অভ্যাসের জন্য। শরীরের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি দেখা গেল না। এবার জল বে-খেয়াল হইয়াছিল না। তবে জল না খাইলে যে জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহা বেশ সুন্দর দেখা গেল।

সাহবাগে প্রথম প্রথম যখন পড়িয়া থাকার ভাবটি খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন দেখা যাইত দুধ জল প্রভৃতি তরল দ্রব্য খাইতে দিলে, চুমুক দিয়া খাইতে পারা যাইত না। শ্বাসের গতি সর্বক্ষণ একভাব স্থির থাকিলে এইরূপ অবস্থা কোন কোন সময় হইয়া থাকে। প্রথমে দেখা গেল, চুমুক দিয়া টান দিলেই সব তালুতে যাইয়া উঠে। কিছুদিন পরে চুমুক দিয়া খাওয়ার ভাবই চলিয়া গেল। এই রকম কিছুদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। শেষে চুমুক দিয়া খাওয়ার ভাবই বে-খেয়াল প্রকাশ। চামচ দিয়া দুধ খাওয়ানো হইত। তাহাতে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিল।

রায়পুর আসিবার পূর্ব হইতেই এ শরীরের খাওয়ার ঠিক ছিল না। কোন দিন সামান্য ছাতু ও দই, কোন দিন সামান্য ফলাদি, কখনো দুধ খই। আবার কৃচিৎ কখনও কোন কোন মাসে ২/১ দিন রুটি ও তরকারি সিদ্ধ, কোন দিন কেবল তরকারি জলে সিদ্ধ। কখনো ভোলানাথ বা অন্য কাহারও পীড়াপীড়িতে কয়েক গ্রাস ভাত খাওয়া হইত। এইরূপ অনির্দিষ্ট খাওয়া। রায়পুর আসিলে দেখা গেল জিনিষপত্র কিছুই মিলে না, তরকারি একেবারে পাওয়া যায় না। জ্যোতিষকে বলা হইল এখানে যা পাওয়া যায় তাহাই খাইব। ২/৪টি আলু সিদ্ধ ও এক পোয়া দুধই সাধারণতঃ ব্যবস্থা ছিল। জ্যোতিষ কোন দিন খুঁজিয়া আম এবং পেঁপে নিয়া আসিত। পরে যখন তাহাও মিলে না তখন আমি কি খাইব তাহার ভাবনা হইলে বলিতাম আমার জন্য ভাবিস না। তোদের জন্য রুটি বা যাহা রান্না হয় তাহা হইতে সামান্য কিছু দিলেই হইবে। প্রায় এই নয় বৎসর, সময় মত কি খাওয়া শোওয়া শুনিয়াছিস দেখিয়াছিস ত। তখন আর ঐ আলুও পাওয়া যাইত না। সে সময় সকলেরই একবার বেলা ৪টার সময় খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

ঢাকা হইতে যাত্রা

ব্যারামের পর ৪/৫ বৎসর চাকুরি হইয়া গেলে জ্যোতিষ হাওয়া পরিবর্তনের জন্য সে সময় ৪ মাস ছুটি নিয়াছে। দার্জিলিং যাইবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছে কিন্তু যাই যাই করিয়া যায় নাই। ঢাকায় আছে। আশ্রমে প্রায় সময়ই আসে।

একদিন বিকালে বীরেনকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী গেলাম। ঐখান হইতে সন্ধ্যায় আমি পঞ্চবটীতে গিয়াছি। সেখানে শুইয়া শুইয়া কথা বলিতেছি। রাত্রি ৯টার সময় কি এক খেয়াল হইল — আজই কোথাও যাইতে হইবে। ভোলানাথকে ডাকিয়া একথা জানাইলাম। হঠাৎ শুনিয়া বলিল — আর কে যাইবে? বলিলাম — জ্যোতিষ ছুটিতে আছে, তাহাকে ডাকিব। ভোলানাথ বলিল — আচ্ছা।

যোগেশকে বলিলাম — একখানি গাড়ী নিয়া জ্যোতিষকে লইয়া আস। কিছু বলিবার দরকার নাই। তাহাকে নিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম — রাত্রি কত হইয়াছে? আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে? পার ত এখনই চল। দেখিলাম সে একটু চুপ হইয়া গেল এবং বলিল যে বাসায় যাইতে হইবে, টাকা পয়সা আনিতে হইবে ত।

তাহাকে বলিলাম — আশ্রমে যাহা পাও তাহা লও। বল যাইতে পারিবে কিনা? আরও একবার জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল — আচ্ছা, যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

তখন আশ্রমে খুব কান্নাকাটি আরম্ভ হইয়াছে, শশাঙ্কবাবু আসিয়া অনেক কথা বলিল। কোথায় কিভাবে থাকিব জিজ্ঞাসা করিল। আমি পঞ্চবটী হইতেই রওনা হইলাম। স্টেশনে আসিলে কোথাকার টিকিট করিব জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম — এ গাড়ী যতদূর যায় ততদূর যাইব। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।